সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যুদ্ধে ব ংলা নাটক

নীলকণ্ঠ ঘোষাল

যুদ্ধ যেখানে দাঁড়িয়ে , সমাধান না পাওয়া গেলে । সমস্যা হয় দু-দিকেই ---উপপাদ্য বিষয়টি বোঝার এবং বোঝাবার। মার্কসের একটি উক্তি নিয়ে তাই হয়েছে। পুরো উক্তিটি হল--- 'Religion is the opium of the masses and heart of the heartless world.' আমরা যারা যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের পতে হাঁটতে ভালোবাসি, যাঁরা ধর্ম-বিশ্বাসের অন্ধ মোহ থেকে মানুষের মনকে বিজ্ঞান ও যুক্তির পথে টেনে আনতে চেয়েছি. তারা খুব সহজে ব্যবহারের অস্ত্র হিসাবে শুধুমাত্র উক্তির প্রথম অর্ধেক অংশটিকে ব্যবহার করে করে ধার ও ভার দুটোই নষ্ট না হলেও কমিয়ে ফেলেছি। এক কথায় ভোঁতা করে ফেলেছি। ক্লিশে হয়ে উঠেছে কথাটা। যদি পরের অর্থেকটাও একই সঙ্গে, একই চেতনায়, একই আন্তরিকতায় উচ্চারিত হত---তাহলে বোঝার এবং বোঝাবার সমস্যাটা আজকে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই বৌদ্ধিক বিচ্ছিন্নতার খাদে এসে দাঁড়াতে হত না।

আমাদের দেশের মার্কসবাদী দার্শনিকরা ভারতের নানা ধর্মমত---সনাতন - হিন্দু--ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা বিশ্লেষণ করেননি। যেমন করেছেন আর্নেস্ট ব্লচের মতো মার্কসবাদী দার্শনিকরা খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের ক্ষেত্রে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা যেটা করেছি, সেটা হল আমাদের ঔপনিবেশিক শাসকদের দেখাদেখি ধর্মকে মন্দির, ধর্মগ্রন্থ, পুরোহিত-যাজ্ঞিক, অনুশাসন এবং আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে এনে একটা সংগঠিত ও শৃঙ্খলিত চেহারা দিয়েছি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদকে সংগঠিত হবার কাজে দু-হাত তুলে সমর্থন ও সাহায্য করেছি। অনেক সমাজ - সংস্কারকের অন্যতর কথা তখন আমরা শুনিনি। অথবা বরং ধর্মের ছোঁয়া থেকে সরে থাকতে চেয়েছি। ফল যা হবার তাই হয়েছে। গান্ধীজির কথায় বলা যায়---যদি তুমি সেই পথে পা না ফেল, তাহলে তার শত্রুরা এবং নেতিবাদী ভাষ্যকাররা জায়গা দখল করবে। কারণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো নিরপেক্ষ ভূমি ফাঁকা পড়ে থাকে না দীর্ঘদিন। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে এক করে দেখার এবং এক করে মিশিয়ে দেবার একটা ঝোঁক ও প্রচেষ্টা সর্বত্র। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান আছে---এই বিষয়টিকে মানবতাবাদী, উদারনৈতিক এবং বামপন্থী সমাজতাত্ত্বিকদের সংগঠিত মঞ্চ থেকে ব্যাখ্যা করার, বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন ছিল। তা করা হয়নি। ফলে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা যেন এক হয়ে গেছে। সেটা হয়ে উঠেছে প্রধানত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ জৈনদের সঙ্গে সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব অপেক্ষাকৃত কম । সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকে আদর্শগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যে প্রতিবাদ-- প্রতিরোধ করার বদলে আমরা শুধু তাৎক্ষণিক সমাধানের খোঁজে হাতড়ে বেড়িয়েছি ও বেড়াচ্ছি। প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক অধ্যাপক জি পি দেশপাণ্ডের ভাষায় বলা যায় --- 'You are handling communalism as if it is fire and simply calling for the fire brigade.'

মূল শত্রুকে না চিনে লড়াই কার সঙ্গে ?

ধর্ম-নিরপেক্ষতার ছাপ লাগানো গণতান্ত্রিক জয়ললিতা সরকার বুক ফুলিয়ে ধর্মান্তরকরণ বিরোধী অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন। উদ্দেশ্য কী? কার উপকারে লাগবে এই আইন ? কাকে সাহায্য করবে ? ধর্মকে , না রাজনীতিকে ? ভারতে প্রধ

ানত কারা ধর্ম পরিবর্তন করে সেটা সবাই জানে। ধর্মান্তরের ইতিহাস এখানে দীর্ঘ কয়েক যুগের। ইতিহাসে প্রমাণিত, সম াজের সবচেয়ে দরিদ্র, অবহেলিত, শোষিত এবং হিন্দু সমাজে যাদের নীচের তলায় ফেলে রাখা হয়েছেধর্মের ও সমাজের অনুশাসনের নামে, সেই শূদ্র, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য মেহনতি মানুষরাই এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহন করে। কারণ এদের কাছে কোনো ধর্মই খারাপ নয়, কোনো ধর্মের মানুষই খারাপ নয়। তাই যে-ধর্ম তাকে প্রাপ্য সম্মান দেবে, যে-ধর্ম তাকে যোগ্য অ াশ্রয় ও সামাজিক নিরাপত্তা দেবে---তাকে গ্রহণ করতে সে দ্বিধা করে না। সে সম্মানের সঙ্গে বাঁচাতে চায়। এই কারনেই 'মানুষের অধিকার বঞ্চিত' মানুষ হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম, মানুসংহিতা এবং সামাজিক জাতিভেদের অমানবিকা অত্যাচার ও অসম্মানের হাত থেকে বাঁচবার আকাঙ্খায় তাদের কাছে মুক্তির প্রতীকবৌ দ্ধধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিল। আবার কয়েকশো বছর পরে সেই বৌদ্ধ বা হিন্দুদের যখন মনে হল নতুন ধর্মটিনতুন জীবনের সন্ধান দিচ্ছে, আধুনিক জীবনযাপনের অঙ্গীকার এনেছে, তখন তারা ইসলামকে ও খ্রিষ্টান ধর্মকে গ্রহন করতেও দ্বিধা করেনি। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভাষা, পে াশাক, খাদ্য, আচার সংস্কারের ঐতিহ্যের ব্যাপারে ধর্মন্তরিত মানুষের জীবনে পরিবর্তন করতে হচ্ছে খুবই কম। তাদের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাই হয়নি পরিবর্তিত ধর্মের বাতাবরণে এসে নতুন জীবনচর্যায় মিশে যেতে। তবে একটা ঘটনা ঘটল এবং স্থায়ী হয়ে গেল। যারা মূলত সমাজের অধিপতি অর্থাৎ উঁচু শ্রেণির হিন্দু, যারা পুরনো ধর্মে থেকে গেল, তাদের মধ্যে এই নতুন ধর্ম ও নতুন ধর্মের মানুষদের ওপর একটি বিদ্বেষ ও হিংসা দানা বেঁধে রইল। সেটাই একসময় ধর্মীয় শত্রুতায় রূপান্তরিত হল। হিন্দু থেকে বৌদ্ধ, বৌদ্ধ থকে ইসলাম ধর্মে ও খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া মানুষের সংখ্যা বিরাট। উচচবর্ণ হিন্দুরা মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধদের 'নেড়া' বলত। সেই শব্দটাই উচচারণ পরিবর্তন করে মুসলমানদের দিকে ধেয়ে গেছে। সারা মধ্যযুগ ধরে এই বৈরিতার ইতিহাস। ব্রাহ্মণ্যবাদ নতুন করে নিজেদের সংগঠিত করেছে এবং বৌদ্ধধর্মকে প্র ায় অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে । এটা করেছে হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্মই। যারা ইতিহাসের চালিকাশক্তি, সেই সংখ্যাগু মেহনতি জনতাকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বৈরিতা ও ভেদের অস্ত্রে শান দিয়ে গেছে নানাভাবে। যখন যে রাজশক্তি অনুকূল অবস্থা পেয়েছে সে-ই এই কাজে মদত দিয়েছে সমানে। কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল।

ইংরেজরা এসে সেটাই শিখিয়েছে। শিখিয়েছে তাদের কৌশলে স্বার্থের অনুকূলে। তাদের শেখানো পন্থায় দুই ধর্মের অধিপতিরা বিভেদের বীজ বুনে চলেছে নানা ভাবে। ধর্ম ও মযহম, মন্দির ও মসজিদ, ঐতিহ্য ও তমুদ্দিন নিয়ে তারা নানা ঝগড়ার জিগির তুলেছে। সবই ধর্মেই বহিরঙ্গের আস্ফালন। সবই আনুষ্ঠানিকতার দ্বন্দ্ব ও লড়াই। ধর্মের অন্তরঙ্গ মর্মবস্তু নিয়ে মাথা ঘামায়নি কোনো পক্ষের অধিপতিরা বা রাজশক্তিবর্গ। কারণ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাওয়া যায় সব ধর্মের অন্তস্থলের মর্মবস্তু ও অন্তর্নিহিত পরম পবিত্র লক্ষ্য একদিকেই ধাবিত হয়েছে। আধিপত্যকামী রাজশক্তি, সমাজপতি ও ধর্মনায়করা সেটা জানে খুব ভালো করেই। তারা ধর্মীয় সম্প্রসারণবাদের পথেই পা বাড়াতে ভালোবাসে। ইতিহাসের শিক্ষা হল এই---হিন্দুধর্মের চতুর্বর্ণ প্রথার মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে আছে। নিষ্ঠুরভাবে হিন্দুরা শত শত স ম্প্রদায়ে বিভক্ত যুগ যুগ ধরে সেই বিভে আছে সারা সমাজদেহে, বৌদ্ধিক অন্তরের ও চিন্তায়। জীবনচর্যায় সম্প্রদায়গত তথা জাতপাতগত বিভেদের শিকড় গভীর বিস্তারিত হয়েছে। জন্ম নিয়েছে তার মূল সেই হরপ্পা সভ্যতা ধবংসের মধ্যে থেকে। এই সভ্যতাকে আক্রমণ ও তার ধবংসের যারা কারণ সেই ঋগ্বৈদিক আর্যরা হল 'দেব' আর যারা তাদের হাতে পর াজিত, তার হল 'দাস'। এই শব্দদুটি শ্রেণিবাচক অভিধায় পরিণত হল। বহুবিধ জাতি তৈরি করা হল। চতুর্বর্ণ প্রথা তার শ াখা-প্রশাখা ছড়াতে লাগল। সংখ্যা এত বেড়েচলল যে, তার পরিচয় আজ কোনো ধর্মগু বা ধর্মনায়ক বলতে পারবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠশূদ্রদের ওপর যে মর্মান্তিক ঘৃণা, অস্পৃশ্যতা, শোষণ, নির্যাতন, অপমানের ধর্মরথ (?) চালিয়েছে তার কাহিনি হিমালয়ের চেয়েও ভারী। তারই পরিণাম হল, হিন্দুদের মধ্যেকার শ্রেণি, জাত, সম্প্রদায়গত লড়াই তীব্র ও অশেষ হয়ে উঠেছে একসময়। এই সামাজিক ভেদচিন্তা, ভেদবুদ্ধি শেষ পরিণামে কার্যরপণ প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু মুসলমান বা হিন্দু-বৌদ্ধ বা হিন্দু - খ্রিস্টান ইত্যাদির রূপে ধর্মীয় লড়াইতে মদত জুগিয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে। নেতৃত্ব দিয়েছে সম্পদশালী ক্ষমতাবান সব পক্ষের সুবিধাভোগীরা। প্রছন্ন মদত দিয়েছে রাজনৈতিক শক্তি।

সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সম্প্রদায়গত বিভেদ ও লড়াই জন্ম নিয়েছে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও বিন্যাসের

গর্ভে, ধর্মের গর্ভে নয়। ধর্মকে অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলার এমন মাধ্যম আর কী আছে ? এই পরিকল্পিত বিরোধ, প্রকল্পিত সংঘর্ষ ও উদ্দেশ্যমূলক চত্রান্ত সৃষ্টির পিছনে ধর্মীয় জীবনে বহিরঙ্গ উপাদানগুলি সুপার - ট্রাকচারের কাজ করছে। তার মূল ভিত্তিতে আছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তথা সামাজিক - সাংস্কৃতিক আধিপত্যের চরিতার্থতা।

সংবিদানের ২৫ নং ধারায় ধর্ম বিষয়ক নাগরিক অধিকারকে খর্ব করার যে চত্রান্ত করছে একটি বা দুটি রাজ্য সরকার তার লক্ষ্য দুটি পরিষ্কার ।এক, সমাজের দলিত অচ্ছূৎ শ্রেণি ও সংখ্যালঘুদের ভয় দেখানো ; দুই, সংঘ পরিবারের রামবাদী রাজনৈতিক প্রভূ বা বন্ধুদের মদত জোগানো । কারণ এই সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাবের পরে দেশের ধর্মান্তকরণের ঝোঁক বেশি বেড়ে গেছে। আরও তার কারণ---সমাজে উচচশ্রেণির বা বর্ণের প্রতিপত্তি ও প্রতাপ বা দাপট দ্রুতবেগে বেড়ে যাচেছ নানাবিধ 'সেনা' নামধারী সংগঠনের উদ্ভবের ফলে।

সংখ্যাগু ও সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতা

'সংঘ' পরিবারের প্রকল্পিত 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' তথা 'হিন্দুত্ব' আজ যে দেশের কাছে সবচেয়ে বড় বিপদ এইকথাটা অনেকে মেনে নিতে পারছে না। তার মস্ত বড় কারণ--- শক্তিমান উঁচুবর্ণের প্রত্যক্ষ মদত এবং উচচাভিলাষী মধ্যবিত্তের লোভ ও প্রতিহিংসা । তাছাড়া এই 'তত্ত্বে'র মধ্যে ধর্মকে খুব সূক্ষ্মভাবে ও সুচতুরভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুবই স্থুলভাবে আনুষ্ঠানিকতাকে চাপিয়ে দেওয়ার কাজ চালাচেছ। নানা অনুষ্ঠানে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা হচেছ সারা দেশের যুবসমাজকে। এই কথাটা নানাভাবে চেপে দেওয়া হচেছ যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে কোনো একটি বিশেষ ধর্মেই একচেটিয়া আধিপত্য বা প্রভাব সেই বহুধর্মীয়, বহুজাতির, বহুসংস্কৃতির এই ভারতীয় সংস্কৃতি---এই কথাটা সতেজ ঋজু উচচারণে ও পরিব্যাপ্ত প্রসারতা দিয়ে বলতে না পারলে এই চত্রান্তের বিদ্ধে লড়াই করা যাবে না। বহুধা বিস্তৃত ভারতীয় দর্শনের ও সমাজতত্ত্বের বিচিত্র মিশ্রণকে যত বেশি ব্যাখ্যা ও প্রচার করা যাবে ততই এইগভীর বিকারগ্রস্ত ও ক্ষমতার জন্য উন্মাদ 'সংঘশক্তি পিছু হটতে থাকবে। সেই কাজটি করা হচেছ না। হচেছ না বলেই গুজরাটের গণহত্যায় ধর্মীয় বিবেক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক শক্তি গর্জন করে ওঠেনি প্রত্যাশিত ব্যাপকতায়। কেমন এক উদাসীন, কেমন ভুলে যাওয়া ও সয়ে নেওয়ার মানসিকতা কাজ করছে।'

সংখ্যাগু ও সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য আছে। সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা তৈরি করে। সেই দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। কারণ তাদের মধ্যে এক ধরনের 'নির্যাতিতেরমনস্তত্ব' কাজ করে। তারা বুঝতে পারে না বিচ্ছিন্নতা মানে দুর্বলতা। কেবল ধর্ম-পিপাসা নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষই প্রধান, ধর্ম গৌণ---এই কথাটা মোল্লাতন্ত্র সাধারণ মুসলমানদের বুঝতে দিচেছ না। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি দর্শন, সাহিত্য ----এর মধ্যে ধর্ম নয়, মানুষই যে সার্বভৌম শক্তি-----এই উপলব্ধিতে না পৌঁছতে পারলে এই বিচছন্নতা থেকে মুক্তি নেই।

অন্যদিকে সংখ্যাগু সাম্প্রদায়িকতা তার absolutism -এর গোঁড়ামি নিয়ে ক্রমশ ফ্যাসিবাদের দিকে পা বাড়ায়। বেশিরভাগ শক্তি ও সম্পদকে কব্জা করে সে মদমত্ত হয়ে ওঠে। চিরকালের পরমতসহিষ্ণু বিকেন্দ্রীভূত ধর্ম নীতিকে ও সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে সে কেন্দ্রীভূত ও একছক আনুষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্ব কায়েম করে এবং ক্ষমতা করায়ত্ত করে। সেই কথাটাই বলেছেন আর এস এস -এর কে এস সুদর্শন---- 'Nationalise the minority religions in India.' গুজরাটে ও উত্তরপ্রদেশে তারই পরীক্ষা চালাচেছন তাঁরা। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ৩ ২০০২ সালের ২৭/২৮ ফেব্রুয়ারির ঘটনাগুলি ফ্যাসিবাদের পদধবনি শুনিয়েছে।

মধ্যযুগে নানক কবীর চৈতন্য এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন - বিদ্যাসাগর - রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আলোকের যাত্রা শু হয়েছিল। সেই পথে অন্ধকারের বিভীষিকা ফিরিয়ে আনতে চাইছে ক্ষমতামত্তহিন্দুত্ববাদীরা

।
সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ বিষয় হল---এই দুই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা তাদের জন্মের জন্য পারস্পরের ওপর ভয় দিয়েই জন্মায়। একটি না থাকলে অন্যটির জন্মই হয় না। এরা পরস্পরের পরোক্ষ / প্রত্যক্ষ পরিপূরক। এটা ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক সত্য । এই সত্যটি সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে সঠিকভাবে এক করে বোঝাতে পারবে আমাদের শতচ্ছিন্ন দেশে ?
এই কাজটিই করে আসছে আমাদের বাংলার নাট্যজগৎ বহুদিন থেকে । বলা যায় সেই ১৮৫৪ সাল থেকে। আমাদের আলোচনা ওপরের মূল কথাগুলি মনে রেখেই শু করতে চাই।

বাংলা নাটকের প্রতিপালিত ভূমিকা
প্রথমেই বলতে ইচ্ছে করে ঝিকবির ভাষায়----'এ তোমার পাপ, আমার পাপ।' পাপের শক্তি এমনই যে, ক্রমাগত সংগঠিত ও সংঘটিত হতে হতে সে এক সময় সংবেদনশীল মনেও নিজেকে সহনীয় করে তুলতে পারে। তার জন্য অনেকগুলি চমৎকার অনুষঙ্গকে সে ব্যবহার করে। সেগুলি হল ধর্ম, ক্ষমতা, অর্থ, সম্পদ ও অন্যান্য জৈব ভোগ্যবস্তু । তার মধ্যে সর্বশক্তিমান হল ধর্ম। হ্যাঁ, কেউ বলবেন এটা অধর্ম। ধর্মের নামে পৃথিবীর মানুষ যত পাপ কাজ করছে অন্য কোনো অনুষঙ্গ দিয়ে কোনো কালে তা পারেনি এবং পারবে না। অথচ মজার ব্যাপার হল, ধর্ম নাকি পাপকে খর্ব করে, দমন করে, ক্ষয় করে। কীভাবে করে ? বাস্তবের পাপকে অলৌকিক ও আধিভৌতিক অনুষ্ঠানিক ত্রিয়া প্রতিত্রিয়া দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখা যায় মাত্র। এইভাবে ঢেকে রাখার বাসনাতেই ধর্মীয় অধিপত্যবাদী প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীরা চিরকাল কাজ করে। পাপ ধবংস হয়নি। প্রচ্ছন্ন ছদ্মবেশী হয়েছে মাত্র। এক একটি অনুষ্ঠান এক একটি চমৎকার আড়াল। 'ঘোমটার আড়ালে খেমটা নায়' --এর লোকায়ত প্রবাদটি এই আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কেই বেশি প্রযোজ্য। এই মহিমান্বিত আড়ারালে নিয়ত ঘটে চলেছে অনর্গল অনিবার পাপকর্ম। আড়ালের অন্য নাম ভণ্ডামি। ক্ষমতাবানরা ভণ্ডামির মধ্যে এই দুর্ভাগা দেশকে শাসন করেছে এবং এখনওকরছে। বাংলা উপন্যাসের মতো নাটকও বারবার এই শক্ত ঠাস বুননের রেশমি আড়ালকে ছিঁড়ে বিদীর্ণ করে ভণ্ড-সভ্য ধর্মের কদর্য মুখগুলোকে মঞ্চে উদ্‌ঘাটিত করেছে বারবার।

শু সেই ১৮৫৪ সালে। অপ্রাসঙ্গিক নয় রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব। প্রথম সমাজ সচেতন বাংলা নাটক---সামন্তবাদী কুসংস্কার ও কৌলিন্য প্রথার ধর্মীয় আড়ালে মানুষ মানুষে বর্ণ সম্প্রদায়ের ভেদচর্চাকে তীব্র আত্রমণ করেছিল। তখনকার সংস্কার আন্দোলনের ফসল। বিদ্যাসাগর ও মাইকেল এই নাটককে উৎসাহিত করেছেন। তারপরেই মাইকেল লিখলেন তাঁর চির নতুন প্রহসন---বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। জমিদার ভত্তিপ্রসাদ অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে গরিব মুসলমান প্রজা হানিফের স্ত্রীরূনীলতা নষ্ট করার কাজে উদ্যোগী। হিন্দু - মুসলমান প্রজাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা করার বাস্তববাদী নাটক---বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)। এই সময় শু হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহান সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। সংঘটিত হল কয়েকটি বিদ্রোহ । সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ এবং সুন্দরবন বিদ্রোহ। বাংলার জনমানস আলোড়িত ও জাগ্রত।তারই প্রভাবে রচিত হল রামনারায়ণ, মধুসূদন-দীনবন্ধু-মনোমোহনের কালজয়ী নাটকগুলি। রচিত ও অভিনীত হল নীলদর্পণ ১৮৬০ সালেই। এই বিদ্রোহগুলিতে অত্যাচারের বিদ্ধে বিভিন্ন গোত্রের শ্রমজীবী মানুষের সমবেত প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের উদাহরণ দেখেই এই সংগ্রামী নাটকের সৃষ্টি। নাট্যকার আঁকলেন বিদেশি নীলকরদের শোষণ ও বঞ্চণা ও কুঠিয়ালদের অত্যাচারের বিদ্ধে হিন্দু - মুসলমানদের মিলিত সংগ্রামের ছবি। সম্পন্ন হিন্দু চাষি সাধুচরণ গরিব মুসলমান চাষি তোরাপ হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়েছে। তোরাপ ও সাধুচরণ তাদের ধর্ম ও জাত কী তা মনে রাখেনি। হিন্দু নারী ক্ষেত্রমণিকে শয়তান রোগ সায়েবের ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তোরাপ নিজের জীবন বিপন্ন করচে। সে হিন্দু- মুসলমান সকল মানুষের চোখে বীর নায়ক। শ্রমজীবী মানুষের একটাই সম্প্রদায় ---তারা শোষিত।

তারপরেই মঞ্চে এল মীর মুশারফ হোসেনের রচনা--- জমিদার দর্পণ নাটক। সেটা ১৮৭৩ সালে। সিরাজগঞ্জ কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্কে। নাট্যকার জমিদার ছিলেন। জমিদারদের অত্যাচারের বিদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ

প্রতিরোধের নাটক রচনা করে তিনি নিজের মহত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তৎকালীন সংস্কারাবদ্ধ সমাজে নাটকের চরিত্র নন্নেহ ারের সঙ্গে নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণির মিল আছে অনেক। ১৮৭৪ সালে লেখা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতে যবন ন াটকটি এই শতাব্দীর একটি গুত্বপূর্ণ রচনা। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবংমুসলমানদের অত্যাচ ারের ছবি তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। উলটো দিক থেকে ত্রিয়া করেছে এই নাটক। আরেকটি নাটক, যার নাম চা - কর দর্পণ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ মালিকশ্রেণির বর্বরতার বিদ্ধে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমজীবী মানুষ মিলিতভাবে খে দাঁ ড়িয়েছে । নাট্যকার হলেন দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়। রচনাকাল ১৮৭৫ সাল।

ইতিমধ্যে 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' -এর জায়গায় 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' শু হল। ১৮৭৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর থেকে এখ ানে অভিনয় শু। এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার সেখানে এই কাঠের ঘরটি নির্মিত হয়েছিল। উদ্বোধনের রাতেই থিয়েট ারটি আগুনে পুড়ে যায় পুরোপারি। আবার নির্মিত হল রঙ্গমঞ্চটি । ১৮৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে একবছর ধরে ন ানা নাটক অভিনীত হল সেখানে। ভারতের নানা জায়গায় অভিনয় করে ঘুরে বেড়িয়েছে এই থিয়েটারের দল। এই থিয়েট ারে প্রথম পাঁচ জন নারী অভিনেত্রী অভিনয়ে যোগ ছিলেন। পরে যোগ দিলেন খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী। এই থিয়েট ারে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে অভিনীত হল কয়েকটি নাটক ও প্রহসন। এই সকল নাটকের বিদ্ধে রাজরোষ গর্জে উঠল। অনেক প্রভ াবশালী মানুষেব প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে সরকার ঘোষণা করল Dramatic Performance Control Bill । ভারতে প্রথম সরকারি নিয়ন্ত্রন আরোপ করা হল নাটকের ওপর। এখানে একটি বিষয় খুবই প্রাসঙ্গিক যে, 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জামিদারতন্ত্র বা কৌলীন্য-প্রধাণ বিষয়ের বদলে গণতন্ত্র তথা জাতিধর্ম নির্বিশেষে স ামাজিক সাম্যচিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল। মাইকেল - দীনবন্ধুর নাটকে প্রগতি, সমাজ সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটেছিল। নীলদর্পণ নাটক দিয়ে এই থিয়েটার তার যাত্রা শু করেছিল । বাংলা নাটকের চলার পথে ন াট্য-বিষয় ও নাট্য-চিন্তার ক্ষেত্রে এটা এক উজ্জ্বল অথ্যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে এল হিন্দু সমাজের যাবতীয় কুপ্রথা কুসংস্ক ার, সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার বিদ্ধে ব্যাপকতর মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস।

হজরত মহম্মদ নামক একটি নাটক লিখলেন অতুল মিত্র। অভিনীত হল ১৮৮৬ সালে। কিন্তু নাটকটি সাম্প্রদায়িক বলে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। এর পেছনে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চাপ ছিল। গুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই বছরটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি রক্তরাঙা বছর। এই বছর ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমজীবী মানুষের রক্তে লাল হল রাজপথ এবং শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব পতাকা। এক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'।
এইভাবে শেষ হল ঊনবিংশ শতাব্দী। স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হল। এল কার্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব। দিকে দিকে ধবনিত হল প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, আন্দোলন (১৯০৫)। সর্বব্যাপী গণআন্দোলন, রাখিবন্ধন ইত্যাদি দেশপ্রেমের জোয়ারে ইতিহাসচেতনা সমৃদ্ধ একের পর এক নানা নাট্যসম্ভার নিয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র - অমৃতলাল-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদ প্রসাদ। রাংলা মঞ্চ উত্তাল হল। নাট্যশালা ও জাতীয় আন্দোলনের মঞ্চ যেন একত্রীভূত হল প্রবল গণপ্রতিবাদও জাতীয় জ াগরণের চেতনার মোহনায় এসে। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ দূরে চলে গেল।

এই উত্তাল সময়ে মঞ্চস্থ হল গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা ১৯০৫ সালেই। জাগ্রত বাঙালি তাদের সংগ্রামে এই ট্রাজিক ন ায়ককে পেয়ে বরণ করে নিল পরম আগ্রহে । তার কণ্ঠে শুনতে পেল হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত আহ্বান---'যদিকখনও জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়... যদি সাধারণ শত্রর প্রতি একতায় খড়গহস্ত হয়---এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব।' এই নাটকে মানুষ এমন কয়েকটি হিন্দু ও মুসলমান পবিত্র চরিত্র এবং কিছু দেশদ্রোহী চরিত্র দেখতে পেল যা এর আগে কোনো নাটকে এইভাবে আসেনি। জাতীয়তাবোধ এখ ানে একটা বিশেষ স্তরে এসে দাঁড়ায়---সেখানে ধর্মীয় বিভেদে মানবচরিত্রের ভেদ হয় না।ধর্মভেদ এখানে অবান্তর হয়ে গেছে। একই কথা বলা যায় নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কেও (১৮৩৮)। নির্মলেন্দু লাহিড়ী এই চরিত্রটিকে একটি নতুন মাত্রা দিতে পেরেছিলেন। বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল নাটকটি। গিরিশচন্দ্র ও শচীনবাবুব নাটকে দুটি

মুসলমান চরিত্র যথাত্রমে করিমচাচা ও গোলাম হোসেন যেন এক রেখায় দাঁড়ানো দুটি আত্মীয় বিবেক। আজও মানুষ শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদ্দৌলা-র কণ্ঠে 'মিলিত হিন্দু - মসুলমানের গুলবাগ এই বাংলা' শুনতে পেলে উদ্বেল হয়ে ওঠে। জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ নাটকের সমগ্র জগৎ। বাংলার নাট্যমঞ্চে দেখা দিতে থাকল ঐতিহাসিক সব জাতীয় চরিত্র - সির াজদ্দৌলা, মিরকাশিম, প্রতাপাদিত্য, শিবাজি, লক্ষ্মীবাঈ চাঁদ সুলতানা প্রভৃতি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখলেন চাঁদবিবি। ১৯০৭ সালে মঞ্চস্থ হল। আহমদ নগরের চাঁদ সুলতান ও বিজাপুরের আদিল শাহ দীর্ঘদিন ধরে বিবাদমত্ত ছিল। মোঘল আত্রমণের মুখে তারা ঐক্যবদ্ধ হল। আত্মরক্ষায় ঐক্যবন্ধনে বাঁধল হিন্দু-মুসলমান সকলেই। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পত্তন ও রাণা প্রতাপ হিন্দু মুসলমান বিরোধ না দেখালেও স্বজাতির মধ্যে বিজ াতীয় বিরোধে মিলনের বাণী শুনিয়েছে। মনুষ্যত্ব ও মানবপ্রেমের সাধনার মনধবনিতে হয়েছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের কথা না বললে চলে না। যদিও ঝিকবির রচিত এই সময়কালের নাটকগুলিতে সরাসরি হিন্দু-মুসলম ান দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এবং তাদের সম্প্রীতির বিষয় উঠে আসেনি। তবু তাঁর বিসর্জন (১৮৯০), অচলায়তন (১৯১২), মুত্তধ ারা (১৯২২), রত্তকরবী (১৯২৬) এবং রথের রশি (১৯৩২) নাটকগুলিতে যথাত্রমে ধর্মান্ধতা, আচারসর্বস্বতা ও রক্ষণশীলতা, যন্ত্রসভ্যতার বিদ্ধে মানবাত্মর জাগরণ, শোষণের বিদ্ধে সবশ্রেণির মেহনতি মানুষের সংগ্রাম এবং জাতপ াতের বিভেদের বিদ্ধে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ছবি অভূতপূর্ব শিল্পকলায় মণ্ডিত হয়ে উপস্থিত, যা মানুষকে নতুন ঝিজনীন জীবনবোধে উদ্বোধিত করেছে। সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বিদ্ধে এই বোধ ও চেতনাগুলি বিস্ময়কর প্রভাব রেখে গেছে----এ কথা অনস্বীকার্য।

এই শতাব্দীর দুই ও তিনের দশক সামপ্রদায়িকতা ও ধর্মভেদভিত্তিক বিরোধের প্রশ্নে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ভারতের মর্মব াণী ও ঐতিহাসিক জাতীক সত্যকে খণ্ডিত বিকৃত কলুষিত করে জন্ম নিয়েছে তথাকথিত হিন্দু জাতীয়তাবাদও দ্বিজাতিত্ত্ব । জাতীয় জীবনে বিপদের কালো মেঘের জন্ম ও সঞ্চার হয়েছিল এই সময়ে। যেন ভারতের ভবিতব্য লিখে রেখে গেল এই দশকটি। সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ শত্তি এই সময়ে তাদের সবচেয়ে হীন ত্রুর এ অভিসন্ধিমূলক রাজনীতির চাল দিয়েছি । সেই চ ালে জড়িয়ে গেল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ। শু হয়ে গেল বিষবৃক্ষের চাষ। জন্ম নিল আর এস এস ও হিন্দু মহাসভা ন ামের হিন্দু পুনর্জাগরণের মৌলবাদী শত্তি। গড়ে উঠল মুসলিম লিগ। নানা সংঘর্ষ ও দাঙ্গা শু হল। ১৯৩৪ সালে বাবরি মসজিদের ওপর প্রথম আত্রমণ ঘটানো হয়েছিল। শু হল ভারত ভাঙাল খেলা। সচেতন দেশপ্রেমী চিন্তাবিদদের মনে ক্ষোভ ও যন্ত্রণার জন্ম হল। তাঁরা কখনো গর্জন, কখনো আর্তনাদ করে উঠলেন অন্ধকারময় ভবিষৎ সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে । যে যে নাটকের জন্ম হল তার মধ্যে প্রথমনাথ বিশীর পরিহাস বিজল্পিতম এবং জলধর চট্টোপাধ্যায়ের থামাও রত্তপাত উল্লেখযোগ্য । নাটক দুটি হিন্দু - মুসলমান সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে প্রতিবাদ ধবনিত হয়েছিল সঠিকভাবে। এল আরও অনেক নাটক। এল চারের দশক। জাগরণের, প্রতিবাদের ও বিদ্রোহের দশক। সবার আগে নাম করতে হয় ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্যর নবান্ন নাটকের । নানা দিকে থেকে যুগান্তকারী নাটক হিসাবে চিহিত নবান্ন। সংগ্রামী হিন্দু-মুসলম ান অচ্ছেদ্য ঐক্য ঘোষণা করেছে এবং সমবায় কৃষির দিয়ে বাঁচার শপথ নিয়েছে। এক বস্তুবাদী শিল্প সৃষ্টির উদাহরণ এই নাটক। তারপর ১৯৪৬ সালে লেখা হল দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরঙ্গ । তার মধ্যে দেখা গেল জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারের বিদ্ধে হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এই সময় মনোজ বসুর দুটি নাটকে রাখীবন্ধন ও নতুন প্রভাত দুই সাম্প্রদায়ের ঐক্য ও সম্পর্কে নিয়ে বাস্তববাদী চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। এছাড়া শশীভূষণ দাশগুপ্তের দিনান্তের অ াগুন (১৯৪৯) এবং রবীন্দ্র মৈত্রের মানময়ী গার্লস স্কুল নাটক যথাত্রমে হিন্দু - মুসলমান ও হিন্দু - খ্রিষ্টান সাম্প্রদায়িকত ার বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সুন্দরভাবে। এছাড়া সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গুত্বপূর্ণ নাটক হল দিগীন্দ্রে । ভিটেমা টি ছেড়ে চলে আসার সময় মহেন্দ্র মাস্টার প্রতিবেশী আমীন মুন্সিদের ছেড়ে আসতে পারে না। সেই মানবপ্রীতির অপূর্ব দলিল এই নাটক। তাঁর আর একটি নাটক মশাল (১৯৫৪) এই পশ্চিমবঙ্গে বিধবা ললিতা এক মুসলমান শিশুকে দাঙ্গাব াজদের কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তারই আর্তনাদ এই নাটক।

বিখ্যাত নাট্যকার তুলসী লাহিড়ির তিনটি নাটক দুঃখীর ইমান, ছেঁড়া তার ও বাংলার মাটি যথাক্রমে ১৯৪৭, ’৫৬ ও ’৫৪ সালে সারা বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল চেতনার জন্ম দিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষ সেই দুঃখের ও কান্নার দিনে পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়েছে এবং ঘোষণা করেছে---‘আমরা হিন্দু হই , মুসলমান হই, আমরা বৌদ্ধ-খ্রিস্টান যা - ই হই---সবার আগে আমরা বাঙালি।’ তারপর সম্প্রীতির ঢেউ তুলল সলিল সেনের নতুন ইহুদী (১৯৫৩)। এই নাটক মনমোহন ও মৌভী মির্জার মধ্যে প্রীতি ও সহযোগিতার মানসিকতার মহৎ উদাহরণ রেখে গেছে। তার আগে অবশ্য ঋত্বিক ঘটকের নাটক দলিল (১৯৫১) এবং মুনীর চৌধুরীর মানুষ (১৯৫৪) একই ভূমিকা পালন করেছে। দলিল - এর গোপালের মুখে কলিমুদ্দিনের ভাষা ফোটে---‘বাংলার কাটিছ, কিন্তু দিলেরে, কাটিবারে পার নাই।’

কিন্তু যে নাটকের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য, তা হল সাঁকো (১৯৫৪)। ঋত্বিক ঘটকেরএই নাটকটি দেশের দাঙ্গা - কবলিত নিপীড়িত মানুষের জীবনের দলিল। আজও তার প্রাসঙ্গিকতা ও গুত্ব কমেনি। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নাট্যকার মানপ্রাণ ঢেলে একটি মিলন স্বপ্নের রচনা করে রেখে গেছেন।

শচীন সেনগুপ্তর আর্তনাদ ও জয়নাদ (১৯৬১), উৎপল দত্তর ইতিহাসের কাঠগড়ার (১৯৬৫) ও চিত্তরঞ্জন দাসের ঝড়ের পাখি সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সম্প্রীতির ভাবনাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছে। সমরেশ বসুর বিখ্যাত গল্পকে মিহির সেন নাট্যরূপ দিলেন ১৯৬৬ সালে। আদাব তার নাম।

এরপর সাতের দশকের আধা ফ্যাসিবাদ সন্ত্রাসের অন্ধকারের দিন পেরিয়ে ৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় শাসনে এল দীর্ঘ গণ-সংগ্রামের ফলশ্রুতি স্বরূপ বামফ্রন্ট সরকার।

আটের দশকে শু হল সংখ্যাগু হিন্দুদের একটি মৌলবাদী শক্তির আনাগোনা নাড়াচাড়া এবং ফন্দিফিকির। এই ফন্দিফিকিরে ধরা দিল অনেক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দল ও ব্যক্তি। যারা ক্ষমতা ও অর্থের লোভে রাজনীতির জগতে চরে বেড়ায় তারা ওই শক্তিকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ মদত জোগাতে শু করল। ক্ষমতা রক্ষার নানান তরল বাসনায় রাজীব গান্ধী সরকার এই শক্তির হাতে বেশ কিছু ‘অবাঞ্ছিত’ সুযোগ তুলে দিল। অবশেষে নরসিমা সরকারের আমলে ঘটল ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর। সমগ্র ভারতের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী ধর্ষিত হল, বিকৃত হল, কলুষিত হল কয়েক শতাব্দীর পুরনো বাবরি মসজিদের ওপর হিন্দু মৌলবাদী ‘সংঘ’ পরিবারের সুপরিকল্পিত বর্বর অসভ্য আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। ভারতের রাজনীতি, ধর্মীয় বাতাবরণ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলএক বিরাট ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হল। তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় আধার নাট্যমঞ্চ তার ভূমিকায় পেছিয়ে থাকেনি এবং পেছিয়ে নেইও । শুধু তাই নয়, বরং বলা যায় অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন বাংলা মঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার-পরিচাল উৎপল দত্ত। ১৯৯১ -এর ডিসেম্বরে তিনি মঞ্চস্থ করলেন জনতার অফিস নাটক। একটা গভীর ও বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই নাটকে দেখালেন তথাকথিত রামজন্মভূমি উদ্ধারের অছিলায় হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি কী করতে চলেছে। তীব্র ব্লেষে আক্রমণ করলেন তথাকথিত পণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিকদের ও বুদ্ধিজীবীদের কাণ্ডজ্ঞানহীন ভণ্ডামিকে। এই সময়ে মঞ্চস্থ হয়েছে ‘চেতনার’ কবীর (১৯১১) ও ‘সংলাপ’ --এর ধর্মরাজ্য (১৯৯১)।

১৯৯২ তে বাবরি মসজিদ ধবংসের দু-মাসের মধ্যে বিভাস চক্রবর্তীর মঞ্চে এল অন্ধকার থেকে। নাটকটি ছোট হলেও নাট্যকার হর ভট্টাচার্য মুনশিয়ানার সঙ্গে মানবতার জয়গান গেয়েছেন নাটকে---যা সব ধর্মের চেয়েও বড়। ১৯৯৩ সালে মে মাসে অভিনীত হল শিশিরকুমার দাশের রচনা ‘বহুরূপী’র নাটক আকবর বীরবল। ধর্মসমন্বয়ের বাণী নতুন করে ছড়িয়ে দিল এই নাটক কুমার রায়ের নির্দেশনায়। একই সময়ে অভিনীত হচ্ছিল আরও দুটি নাটক। একটির রচয়িতা মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অন্যটির মন্মথ রায়। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির শিরে কঠোর আঘাত হেনেছে এই নাটক গুলি। বুদ্ধদেবের দুঃসময় এই সময়ের এক বহু আলেচিত সফল নাটক। মন্মথ রায়ের লালন ফকির সার্থকনাটক আক্রমণ মঞ্চস্থ হল ১৯৯৩ সালেই। শেখর সমাদ্দারের নাটক তীর্থযাত্রা পরিবেশিত হলর ১৯৯৪ সালে। নাট্য একাডেমি কর্তৃক পুরস্কৃত ও

অভিনন্দিত এই নাটকটি এই সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। ১৯৯৩ সালে আর একটি নাটক পরিবেশন করলেন 'অন্য থিয়েটার' থেকে পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী। যার কাহিনীকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। নাট্যরূপ দিয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। দুটি ব াংলার সীমান্ত- জীবন দিয়ে গড়ে ওঠা এই নাটকের নাম জোছনা কুমারী। শেষে আরেকটি নাটক বাংলা মঞ্চে এল যার ন াম--গ্রাউণ্ড জিরো। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের স্পন্দন শাখার নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৯৯ সালে। বিজ্ঞানের খুঁটিনা টি ও রাজনীতির বিষয়ে নাটকটি দেখিয়েছে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের হাতে কীভাবে মানবতা ও স্বদেশ দুই-ই আক্রান্ত। এই দশকের আর একটি নাটক উষা গাঙ্গুলির কোর্ট মার্শাল -এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

এবার আসা যাক গোধরা - গুজরাট গণহত্যা পর্যায়ে। এই পর্যায়ে প্রথমেই যে নাটকটির কথা বলতে হয়, সটা হল মেফিস্টো (২০০২)। সরাসরি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি না থাকলেও ফ্যাসিবাদের ভয়ংকর চেহারা, যা ভারতের বুকেধর্মের আড়া হাঁটা শু করেছে, ফোটানো হয়েছে এই নাটকে তীব্র ভাষায়। 'চেতনা'--র প্রযোজনায় অধুনা বাংলা নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয়। তার পরে বলতে হয় 'সংলাপ'--এর কুন্তল মুখোপাধ্যায়ের নাটক হায়রাম-এর পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কায়দা সংঘটিত সাম্প্রদায়িক গণহত্যার বিদ্ধে চমৎকার নাট্যকৃতির কথা।
'নাটুকে কোলকাতা'র প্রযোজনা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক কসাইখানার ইতিকথা নাটক উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।
সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে আলোচনার মধ্যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন শাখা প্রযোজিত নাটকগুলির কথানা বললে ব াংলা নাট্য জগতের ভূমিকার কথা বলাই হয় না। তাদের সংখ্যা বহুল নাটকের কথা জানতে পারার অপারগতা স্বীকার করে নিয়ে কয়েকটি নাটকের উল্লেখ করছি। আগেই আলোচিত নবান্ন থেকে শু করে ইতিহাসের কাঠগড়ায় (উৎপল দত্ত) পর্যন্ত অনেক নাটকের কথা বলা হয়েছে বলে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করছি না। উত্তলপ দত্তের আর একটি নাটক প্রফেসর স ামলক অন্যানামে ল্যাবরেটারি নাটকটির কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। মূল রচনা--ফ্রিডরিশ ভোলফ। অন্যন্যের মধ্যে আছে শুভঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা মেহেরজান ও মড়া এবং শ্যামাকান্ত দাসের গুলশন নাটক।পরিশেষে বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুদিত হয়ে যে সব নাটক সম্প্রাদায়িকতার বিদ্ধে বাংলা নাট্যমঞ্চকে লড়ার ভূমিকায় শক্তির জোগান দিয়েছে তাদের কথা কিছু।

প্রথমেই আসে শহিদ শিল্পী--নাট্যকার বিপ্লবী সফদার হাসমির ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাট্য-সংগ্রামে ঐতিহাসিক প্রযোজনাগুলির কথা। তিনি প্রকৃতপক্ষে হিন্দি পথনাটিকার জনক। তাঁর লেখা হত্যারে (বাংলা অনুবাদ --- প্রতিমা হায়দর, ১৯৮৯), অপহরণ ভাইচারেকা (অনুবাদ-শচীন সরকার) এবং সেই বিখ্যাত নাটক হল্লাবোল যা অনুবাদ করেছেন আশরাফ চৌধুরীসহ চারজন। সারা বাংলায় হাজার রজনী অভিনীত হয়েছে এই নাটক। এই নাটক অভিনয়ক ালেই ১৯৮৯ সালের ২ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে তিনি শহিদ হয়েছিলেন। এছ াড়া ভীষ্ম সাহানির তসম (প্রযোজনা গণনাট্য সংঘ--- ১৯৯৫) কবিরা খড়া বাজারামমে (প্রযোজনা ---চেতনা) উল্লেখযে াগ্য। উল্লেখ করা যায় অসগর ওয়াজহতের সবসে সস্তা গোশ্ত্ -এর (বাংলা অনুবাদ গৌতম গঙ্গোপাদ্যায়) কথা। ব াণীব্রত রাজগুর লাফড়া খুব জনপ্রিয় হয়েছিল আসানসোলে তাপস দত্তের পরিচালনায়।

ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ভূমিকায় উজ্জ্বল আরও কয়েকটি নাটকের নাম উল্লেখ করছি এখানে শিবমন্দির---শুভঙ্কর চক্রবর্তী, ধর্মের ধবজা---সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসানকে খোঁজ চলছে---রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, সংঘাত--পর াণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরের হাত---মধু গোস্বামী, ভারতবর্ষ---কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীর ---দীপক সেন, রামঠাকুরের ঘর- --শম্ভু ভট্টাচার্য, আঁধার পেরিয়ে---প্রশান্ত মিশ্র, আশ্রয়---দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ও রাম ধাক্কা--- দেবেশ ঠকুর প্রভৃতি।
নাটক, সাহিত্যের তেমনই এক শাখা যা সদাই সময় সচেতন। কবিতাকে বাদ দিলে আর কোনও শাখাই তাৎক্ষণিক ও চিরকালীন কথাকে একসঙ্গে দ্রুত উচচারণ করে না
এই অভূতপূর্ব দুর্যোগের দিনে ইতিহাসের সবচেয়ে করাল হিংস্রতা যখন ভারতের ভাবীকালকে গ্রাস করতে উদ্যত তখন ন াটক হল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সেই নাটকের সেই মন্ত্রকে হাতিয়ার করতে হবে, যে মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথের গোরা খুঁজেছে-- -'আমাকে আজ সেই দেবতাররই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই--যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন,

যিনি ভারতবর্ষের দেবতা?’

আজ দেশের দুয়ারে দুই প্রধান শত্রু ওৎ পেতে বসে আছে---এক, ভোগবাদ এবং দুই সন্ত্রাসী ধর্মীয় মৌলবাদ তথা ফ্যাসিবাদ। তাই একবিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে নাটককে ‘গ্লোবাল ভিলেজে’ দাঁড়িয়ে বাঁচার জন্য মানুষকে একটি মন্ত্রেরই সাধনা করে বলতে হবে, তা হল---মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে.... হতে হবে তাহাদের সবারসমান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com